ওরে ভী, তোমার হাতে

সুধীর চক্রবর্তী

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

আমরা যখন পঞ্চাশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন চোখে পড়ত অর্থানীতি বিভাগের একজন পঞ্চাশ পেরানো অধ্যাপককে। শাদা আদ্দির ধুতি, ফিন্‌লেক পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে নিউকাট, তেল চুকচুকে চুলে ব্রাশ করা, বেঁটেখাট মানুষ। খাঁটি ক্যালকেশিয়ান। হাতে রেজস্ট্রার নিয়ে করিডর দিয়ে হেঁটে ক্লাশে যেতেন - কোনও দিকে তাকাতেন না। ছাত্রসমাজে গুঞ্জন ছিল, ভদ্রলোক অসম্ভব কিপ্টে। কে বা কারা তাঁরা কাছে দুটাকা চাঁদা চেয়েছিল - ভাগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন টিচারদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে স্টুডেন্টদের ফাংশান? ছিঃ?

ব্যস, তাঁর ওপর থেকে সকলের অভিনিবেশ চলে গেল। তবে সেকালটা একাল নয় বলে কেউ তাঁকে আওয়াজ দেয়নি। ভদ্রলোক ছিলেন নির্বিরোধ ও সচেতন শিক্ষক। ঘন্টা পড়লেই ক্লাশে যেতেন মন দিয়ে পড়াতেন এবং ক্লাশে ওভার স্টেকপতেন না। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে নিরিবিলেতে (আহা, কলকাতা তখন কী শান্ত ও নির্জন) থাকতেন একটা একতলা বাড়িতে। বালিগঞ্জ-হাওড়া টের ট্রামে চড়ে যাতায়াত করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ট্রাম ভাড়া ছিল আসা-যাওয়া বারো পয়সা - তবু ছিল মান্থলি টিকিট। বড়ই বিতব্যয়ী তার মানে, ধূমপান করতেন না, সন্তানাদিও ছিল না। এমন একজন ডাল পার্সোনালিটি যাকে বলে, তাঁর সম্পের্কে কার কৌতূহল ছিল না, প্রত্যাশাও নয়। পক্ষান্তরে তখনকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল রত্নখচিত। কিন্তু এহেন ব্যক্তি খবর হয়ে উঠলেন মৃত্যুর পরে। ততদিনে আমিও বেশ একজন তালেবর অধ্যাপক - ওয়েবকিউটাটিউটা করি! হঠাৎ খবরের কাগজে পড়লাম ঐ কৃপন অধ্যাপক মারা গেছেন। বাড়ি এবং সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে গেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে । কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কী হল? না আহরা সেবিষয়ে কোনও খোঁজ করিনি।

ষাটের দশকের শেষের দিকে সরকারি কলেজে আমার এক সহকর্মীর কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল। ধরা যাক তাঁর নাম শশাঙ্কবাবু। আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। সাধারণ চেহরা, ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন খুব কম দামের, পায়ে কের্ডস জুতো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়াতেন। আধুনিক সাহিত্য পড়াতে বললে বলতেন, না না, ওসব আলনারা পড়াবেন। কত কী জানেন। আমরা আগেকার লোক তো - তেই আর্ট ফর আর্টস্ সেক-ঐর যুগে পড়ে আছি। একদম মর্ডান নই - কী চিন্তায় কী জীবনযাপনে।

একদিন বিকেলে সস্ত্রীক গেলাম শশাঙ্কবাবুর বাসাবাড়িতে। দুই ছেলে খেলতে গেছে মাঠে। বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী। ওঁরা হাওড়ার কেন্ গ্রামের মানুষ। সেই সব গল্প বলছিলেন। হঠাৎ উঠে গেলেন এবং মিনিট কুড়ি পরে দিব্যি পরিপাটি করে ট্রে-তে করে চিঁড়ে ভাজা, হালুয়া আর ধূমায়িত চা নিয়ে টেবিলে রাখলেন। লজ্জিত মুখে বললেন, নিন খান। সাম্যন্য কিছু। মাসের শেষ তো।

আরে স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, এসব এত তাড়াতাড়ি আলনিই বানালেন নাকি? লাজুক হেসে বিনয়ী শশাঙ্কবাবু, যিনি নাকি একদম মডার্ন নন, বললেন, আমার গিন্নি তো সারাদিনই সবদিক সামলাচেছন। আলনারা এসেছেন - উনি এখন একটু গল্প কন। কী, চা ভাল হয়েছে তো?

সাংসারিক কাজেকর্মে একেবারে আনাড়ি এরং খানিকটা সামন্ততান্ত্রিক আবি। আমার দিকে চেয়ে স্ত্রী একটু ঠোঁট টিলে হাসলেন।

এহেন নিরীহ শশাঙ্কবাবুর জীবনটি ছিল একেবারে সাদামাটা, ঘটনাহীন। এইভাবে চলে যাচ্ছিল আমাদের কলেজীয় দিনগুলো। তারপরে হঠাৎ একদিন টিফিনের সময়ে দেশা গেল অধ্যাপক কক্ষের সহকারী নারায়ণ টেবিলে আমাদের সামনে রাখল একটা করে কোয়ার্টার প্লেট - তাতে চার রকম মিষ্টি, কাজু বাদাম, বিস্কুট ও নিমকি। কী ব্যাপার? স্টাক কীউন্সিলির কেনও সভা তো নেই! কেনও অধ্যাহক-অধ্যালিকা সন্তানদের পরীক্ষা সাফল্যের খবরও নেই, তবে? সকলকে খাবার দেওয়া হলে শশাঙ্কবাবু বললেন, একটু পরে চা দেবে নারান, কেমন?

সকলের সেৎসুক জিজ্ঞসা কী ব্যাপার শশাঙ্কবাবু? অকেশ্যানটা কী বলুন তো? তেমন কিছু নয়, বিনীতভাবে বললেন শশাঙ্কবাবু আজ আমার শিক্ষকজীবনের পঁচশবছর পূর্ণ হল তো, তাই সামান্য একটু আয়োজন করেছি ... ছোটবেলা থেকে ভাবতাম শিক্ষক হব ... শিক্ষক তার জীবনে পেলামও তো কত ... কত ছাত্র-ছাত্রী কত সহকর্মী ... তারই সামান্য প্রত্যুপহার ...।

স্মিত মুখ আত্মতুষ্ট মানুষটাকে দেখে খুব ঈর্ষা হল। কী পবিত্র মুখাবয়ব। কী প্রাপ্তির পূর্ণতা! কলেজের সমস্ত শিক্ষাসহায়ক কর্মীরা মিষ্টি খেতে খেতে জানতে পারলেন এজন স্বপ্নবাদী শিক্ষকের আজ পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব।

বলাবাহুল্য সুদীর্ঘ শিক্ষকজীবনে শশাঙ্কবাবুর ঘটনার কোনও পুনরাবৃত্তি দেখিনি। তবে আমার শিক্ষকতার রজতজয়ন্তীতে শশাঙ্কবাবুর প্রায়াসের অনুসরণ করেছিলাম - তখন আশির দশক - ব্যাপারটা বহু জনই ভেবেছিলেন বাড়াবাড়ি। জানিয়েও ছিলেন কেকে কামড় মেরে কেউ কেউ শিক্ষকতা না ছাই, এখনও স্কেলটাই দিল না। প্রমোশন ফ্রমোশনের বালাই নেই। তার আবার পঁচশ বছর, রাখুন তো!

সবাই নিশ্চয় অমন করে ভাবেননি। কিন্তু ঐ আশির দশকেই আমাদের শহরে ছিলেন প্রধান অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। তাঁর কাছে অনেক শুনেছি সেকালের লেখা-পড়ার কষ্টের কথা। বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রামে মানুষ। প্রচুর পথ

হেঁটে স্কুলে যেতেন - দারিদ্র্য অনাহার ও একবস্ত্রসার জীবন। কলকাতায় এম. এ. পড়তে এসে কতবার খেতে পাননি। ‘কী করতেন? খিদে পেত না?’ আমার এমন প্রশ্নের জবাবে ক্ষুদিরামবাবু হো হো করে হেসে বললেন, কুড়ি বাইশ বছরের গাঁয়ের ছেলে - খদে পাবে না? কী করতাম জানেন? সারারাত শ্যামাসংগীত গেয়ে কাটিয়ে দিতাম।

‘সেবার তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র শহরের পুরভোটে জেতে কমিশনার হয়ে প্রণাম করতে এসে বলল, বলুন স্যার আপনার জন্যে কী করতে পারি। কিছু একটা পরামর্শ দিন ভাল কাজের।

ক্ষুদিরামবাবু বললেন, আরে না না - আমার জন্যে কী আবার করবে। খাসা আছি। আর পথ ঘাট নালা নর্দমা স্ট্রিট লাইট সবই ঠিক আছে। কোনও অভিযোগ নেই। তবে সত্যিই যদি কিছু করতে চাও তো একটা সামান্য প্রস্তাব আছে বাবা। বলন। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

দ্যাখো। শিক্ষকদের জন্যে তো কেউ কিছু করে না। এই গলিতে আমরা পাঁচটি শিক্ষক পরিবার থাকি। এ রাস্তাটার তো কেনও নাম নেই, নতুন গড়ে ওঠা গলি। এর নাম দাও শিক্ষক সড়ক। পারবে?

পেরেছিল সে। আমাদের জন্যে তো কেউ কিছু করে না। আমাদের শহরের প্রান্তে একটা সাধারণ কণ গলি, তার নাম এখন সত্যিই শিক্ষক সড়ক। পশ্চিমবাংলার আর কি কোথাও আছে শিক্ষকদের নামে রাস্তা? প্রশ্নটা শুনে একজন চুঁচুড়ানিবাসী সগর্বে বললেন, আমাদের চুঁচ্ড়ো স্টেশনের সামনে আছে শিক্ষক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের একটা স্ট্যাচু। ভাবতে পারেন এখন?

ভাবতে যে পারি না তাঁর কারণ এখনকার সমাজ শিক্ষকদের আর উদাহরণীয় ব্যক্তি বলে ভাবেন না। পথে ঘাটে যত্রতত্র এখন তাঁদের মুন্ডপাত চলে। ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস এবং নানা স্তরের শিক্ষকদের প্রকাশ্য, বা চোরাগোপ্তা টিউশ্যনী এখনকার পাবলিক একই চোখে দেখে। সেদিন এক রইস গার্জেন বললেন, ‘ছেলে এইচ. এস দেবে তাই ছটা টিচার রেখেছি। যাকে বলে মশাই নেসাসারি ইভ্ল্। ছেলেটাকে তো এগ্জামে পারফর্ম করতে হবে।’ কেন জানিনা এধরনের কথাবার্তা আমার কানে ঝাঁটা মারে কেননা আমিও ঐ পালকের পাখ - এখন নাহয় খাঁচা ছাড়া। কোথায় কী যেন কাঁয়া বেঁধে - টিচার রেখেছি শব্দবন্ধ শুনে রক্ষিতা রাখার আস্পর্ধা ফুটে ওঠে। সেদিন ট্রেনে একজন নিত্যযীত্রী ছোকরা নানা রকম কুইজ্ কপছল। সবাই দাঁত বার করে হাসছিল। অভস্য অশালীন দেশ এখন, চিবোধ ও সম্ভ্রম একেবারে লোপাট। তাই ট্রেনযীত্রীদের কেউ কেউ হকারদের সঙ্গে সমানতালে ইয়ার্কির দোহারকি করে - ভুলে যায় যে কামারায় প্রবীণ বৃদ্ধরা কিংবা নারীরা আছেন। তাই হকারকে উশ্কে দিলে সে ছড়া কেটে বলে

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে টিয়া -
দাদুর টাকে লেখা আছে
ম্যায়নে পেয়ার কিয়া।

তারপরই হা হা জগঝম্প সমবেত কণ্ঠে।

এসবের তো কেনও প্রবাদ হতে পারে না এখনকার দিনে। তাই সেদিনের নিত্যযাত্রী ছোকরা যখন কুইজের ছলে বললে, বলুন তো দাদাগণ দিদিগণ - আজকাল লোর্খা কেন বেশি বেশ বিত্রি হচ্ছে?

আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে গেলাম - এইরে নিশ্চয়ই মুসলমানদের এক্ষুনি মুন্ডপাত শু হবে। ধর্ম-মৌলবাদ-অব্র-বোরখা। না, আমার আশংকা সত্যি হল না। বোর্খা কেন আজকাল বেশি বেশি বিত্রি হচ্ছে বলতে পারলেন না তো পাবলিক? ছেলেটা এবার চারদিকে তাকিয়ে নিলে উত্তরের আশায়, তারপরে বললে, এ কুইজ্টা কঠিন। তবে শুনুন। টিউশনি বন্ধ হয়ে গেছে বলে মাস্টারেরা এখন ব্যাপক বোর্খা কিনছে।

কেন? কেন?

বোরখা পরে টুক করে ছাত্রছাত্রদের বাড়িতে পড়াতে ঢুকে পড়ছে। ছি ছি আমার গালে সপাং করে চাবুক লাগে।

এ রকম অসহায় মুহূর্তে আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে সত্যানন্দ প্রামানিক মশায়ের মুখাচ্ছবি। ষাটের দশকে ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের জেলা শহরের নামী সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার। শন্তিপুরের মানুষ। শার্ট প্যান্ট পরতেন - কড়াধাতের নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষক। ইংরিজি বিষয়ে এম. এ. ও - শিক্ষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিদেশি, মানে খোদ লিড্সের ডিগিধারী। সারাক্ষণ স্কুলের সর্বত্র, করিডরে অফিসঘরে, ক্যান্টিনে রাউন্ড দিলেন। ভালো ছাত্রও নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষাকদের তোয়াজ করতেন - ফাঁকিবাজ বা অলসদের স্পষ্টভাষায় জানাতন তাঁর বিতৃষ্ণা। এমন মানুষের জনপ্রিয় হওয়া কঠিন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল এবং তার কারণ একটা দুষ্প্রপ্য ইংরিজি বই। বইটার নাম ingoldsby Legends উনিশ শতকের এই বই থেকে ইংলন্ডবাসী ডি. এল. রায় মানে আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল হাসর গানের মডেলটা নকল করেছিলেন। বইটা যাকে বলে গ খোঁজা খুঁজছিলাম। শহরের একটা ঘরোয়া সভায় সত্যানন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ হতে তাঁকে হঠাৎই বইটার কথা জিগ্যেস করলাম। খুব স্মিত হেসে বলেলেন, বইটা আমারই তো আছে - বিলেতে কনেছিলাম। তবে এখানে নেই, আছে আমাদের শান্তিপুরের বাড়িতে। দেব এই উইকএন্ডে। আসবেন আমার কোয়াটারে, রবিবার সকালে।

রবিবার সকাল নটা নাগাদ গেলাম। সাবেক বনেদি বাড়ির স্কুল, কাঠের সিঁড়ি। অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা কপলেন। শাদা হাফশার্ট শাদা ট্রউজার - অমলিন হাসি। চেয়ারে বসতেই চোখে পড়ল সারিবদ্ধ বইয়ের আলমারি। আমার প্রার্থিত বইটা হাতে দিয়ে চা দেবার অনুমতি চেয়ে নিয়ে অন্দরে গেলেন। খাঁটি বিলিতি এটিকেট-দুরস্ত মানুষ। ‘ওহে চা দিয়ে যাও’ কিংবা ‘এ ঘরে দু’কাপ চা পাঠাও তো’ জাতীয় হাঁকার পাড়লেন না। বললাম সপ্রসংশভাবে, বিলেতে থাকার কারণেই রোধহয় আলনি এতটা ডিসিপ্লিন্ড্?

উঁহু, একেবারই না। লেশাকটাই শুধু আমার সাহেবি। আমার জীবনের আদর্শ হলেন দুজন - রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী। ওঁদের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মী আবি তো অন্তত কেনও ভারতীয়ের মধ্যে দেখিনি। ওঁদের সব লেখা আবি বারবার পড়ি। ওঁদের সম্পর্কে দেশেরও বিদেশে যত বই, সন্তত বাংলা আর ইংরিজি ভাষায় আছে, সবই আমার সংগ্রহে আছে।

গর্বিত মানুষটি আত্মতুষ্টিতে একটু পিন ফোটাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তখনকার কালে দুর্লভ একটা বইয়ের নাম করতেই* সত্যানন্দ হেসে সাবলীলভাবে একটা আলমারি খুলে বইটা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বইটা নিয়ে যেতে পারেন। পড়ে ফেরৎ দেবেন কেমন?

একেবারে আমূল অপ্রতিভ হয়ে বললাম, বদলির চাকরি আপনার। এতগুলো নিয়েই বরাবর মুভ করেছি। বাকি প্রায় কুড়িটা আলমারি আছে দেশের বাড়ি শান্তিপুরে। বিটায়ার করে একেবারে ওখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হব। বই ছাড়া কি একজন টিচারের জীবন চলে, বলনু তো?

আর ক’ বছর চাকরি আছে?

মেরে এনেছি। আর পাঁচ বছর।

আটখানা আলবারি নিয়ে বরাবর মুভ করেছেন বললেন। কবার মুভ করেছেন, মানে মোট ক’বার বদলি হয়েছেন?

আন্দাজ কন তো!

চার পাঁচ বার !

উঁহু, পাললেন না। এগার বার। কেন বলুন তো? বাবা নাম দিয়েছিলেন সত্যানন্দ, বোধহয়, আনন্দমঠ পড়ে। কিন্তু সত্য মানে ট্রুথ - তার স্বরূপ জানলাম রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী পড়ে। জানেন তো এদেশে সত্যের জন্য মূল্য দিতে হয়। আপনার প্রিয় ডি. এল. রায়কে ক’বার বদলি করেছিল? সতের বার। কেন? জেদি আর সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলে। সাহেবিয়ানাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন বলে, তাই না?

সে তো ব্রিটিশদের দমননীতি। আপনি স্বাধীনদেশেই এতবার?

সত্যানন্দ প্রামাণিক স্মিত হেসে বললেন, একে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের চেলা তায় শিক্ষক। অর্থ কিন্তু তেমন নেই আমার। সম্মান আর আত্মমর্যাদা-বোধটা বিসর্জন দিতে পারি না, পারিনি। তাই আমলাদের ইচ্ছেয় এগারবার ... হা হা হা।

২

সত্যনন্দবাবুদের মাতো সত্যসন্ধীদের এসব আখ্যান কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কালের নয়, বড়জোর চারদশক আগেকার। এখন আর এ রকম বইপড়ুয়া এবং আলমারি সমেত বদলি হওয়া হেডমাস্টার যে একজনও নেই তা হলফ করে বলা যায়। সত্যিকথা বলতে কি, স্কুল বিল্ডিংয়ের মধ্যে বসবাসকারী হেডমাস্টারই পাওয়া কঠিন। এখন বেশিরভাগ স্কুলেই হেডমাস্টার হলেন কমিউটার। ট্রেন বন্ধ হলে বা অবরোধ থাকলে সেদিন আর বিদ্যালয়ে এলেনই না - আর বামনু গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। কলেজ বা স্কুল সন্নিহিত কোয়ার্টারে বসবাস করা খুব নিরাপদও নয় - নানান উটকো ঝামেলা এসে জোটে। আমাদের চিরঞ্জিৎ দাশগুপ্তের কথাই ধরা যাক। নিপাট বালমানুষ। ছিলেন প্রণিবিদ্যার খ্যাতমানা অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজে। কী যে দুর্মতি হল, হঠাৎ অধ্যক্ষ হবার বাসনা জাগল মনে। পোস্টিং হল মফস্‌সলের এক সরকারি কলেজে। পন্ডিত আর ধর্মভী মানুষ। প্রশাসনের কিছুই বুঝতেন না। অচিরে কলেজে ছাত্রদের দুটি বিবদমান রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং কর্মচারীদের দুটি যুযুধান সমিতি তাঁকে জব্দ করে দিল। সুযোগ সন্ধানী দু-চারজন অধ্যাপক পাঁকে পড়া হাতির দুরবস্থা থেকে পরামর্শ দিতে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃস্বাস ছাড়লেন কিন্তু কলেজটা কব্জা করে ফেলল অন্য ধরনের নানা স্বার্থপর মানুষ।

এইভাবে গড়িয়ে চলতে চলতে এসে গেল ভর্তির ধুন্দুমার নাটক। সিট বাড়াতে হবে - দাবিদার সকলেই। জেলা শাসক গভর্নিং বডির সভাপতি। বললেন, কিছুটা মেনে নিন। শিক্ষা অধিককর্তাকে ফোন কপতে তিনি বললেন, ট্যাক্‌টফুলি সব ম্যানেজ কন - বুঝতেই তো পারছেন। এদিকে স্টাফ কাউন্সিল বলছে, স্টুডেন্ট-টিচার রেশিও নষ্ট করা চলবে না - একটাও বাড়তি ছাত্র আমরা অ্যালাউ করব না। ছাত্রদের বিবদমান দুটো সমিতি হঠাৎ এক হয়ে বলল আমাদের দাবি না মানলে ঘেরাও করব। অধ্যাপক সমিতি প্রস্তাব নিল অনির্দিষ্টকাল কলেজ বন্ধ করে দিন। বিকেলে দিকে চিরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত একা থাকেন কোয়াটারে। ট্রাংকুইলাইজার খেয়ে বিছানায় ছটফট কপছেন এমন সময় বাগানে পদশব্দ। নাইট গার্ড নিদ্রামগ্ন, সেই সুযোগে একদল ব্যক্তি ঢুকে পড়ল দক্ষিণের শুনশান পাঁচিল টপকে। তাদের একজনের হাতে একটি বিভলবার - অন্তত চাঁদনিরাতে আধোঘুম থেকে ওঠা অধ্যাপকের তাই মনে হয়েছিল। তাদের বক্তব্য বেশি কিচাইন করবেন না। তাবলে বউকে সাদা থান পরতে হবে। কাল সব কটা ছাত্রকে ভর্তি করে নেবেন।

পরদিন কলেজে জোর তৎপরতা। জেলা শাসকের প্রতিনিধি এস. ডি. ও, পুলিশের পক্ষে জি. এস. পি, সঙ্গে পি. ডব্লু. ডি-র এক্সিকিউটিভ উঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই রাতারাতি নিরাপত্তার কারণে অধ্যক্ষের খোলা বারান্দা গ্রিলের জাল ঘেরা হল। তারপরে বসল পুলিশ চৌকি। অধ্যক্ষ পেলেন দেহরক্ষী। অধ্যাপকরা কানাকানি কপলেন ছ্যা ছ্যা, এডুকেশ্যানাল উনস্টিটিউশানে পুলিশ? একজন টিচার কাম-অ্যাকাডেমিশিয়ানের সঙ্গে বডি গার্ড?

কিন্তু সত্যিই তাই। প্রিন্সিপালের ঘরের সামনের টুলে শাদা পোশাকের দেহরক্ষী। তিনি কোয়াটারে যাবেন, দেহরক্ষী। তিনি সপ্তাহান্তে কলকাতা যাবেন, সঙ্গে দেহরক্ষী। দেহরক্ষী, যার বাড়ি বেলঘরিয়ার, নাম পল্টু দত্ত, বেশ মাইডিয়ার লোক। সারাদিন টুলে বসে মস্করা করে আর ছাত্রদের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে চান মারে। ছাত্রীদের সঙ্গে হিন্দি সিনেমার গপ্পো করে। অধ্যক্ষ যা খান পল্টুকেও খাওয়ান। তিন মাসে পল্টু র ভুড়ি নেমে গেল। তিনমাস পরে অবশ্য দাশগুপ্ত বদলি হলেন রাইটার্সে। এলেন রায়চৌধুরী। বেশ বলিয়ে কইয়ে লোক, বুদ্ধিমান। বাবা বাছা বলে ছাত্রদের প্রথমেই পটিয়ে ফেলে প্রস্তাব দিলেন একদিন স্টাফ ভার্সাস স্টুডেন্ট ফুটবল খেল্ তোরা। কেল্লা ফতে। জর্সি পরে সর্ট পরে ফুটবল বগলে নিয়ে অধ্যক্ষ সটান মাঠে। ছাত্ররা গদগদ হয়ে বলল, প্রিন্সিপ্যাল হ্যায় তো এইসা।

অধ্যক্ষ পায়চৌধুরী তাঁর সল্টলেকের বাড়িতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের মাঝে মাঝে ডেকে এনে বিরাট ফুল প্লেটে কাটলেট ফ্রাই মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। ছাত্রফ্রন্ট ঠান্ডা। এবারে কলেজের বন মহোৎসবে শিক্ষামন্ত্রীকে এনে তাক লাগিয়ে দিলেন। দুষ্টু লোকে বলতে লাগল, এই সুযোগে বেটা করল কি জানেন? মিনিস্টারের কাছে তদ্বির জানিয়ে রাখল যাতে ক্যালকাটায় পোস্টিং হয়। বহুৎ জাঁহাবাজ।

কিন্তু দেহরক্ষী পল্টু থেকে গেল। একজন অধ্যাপক বুঝি বলেছিলেন, আগের প্রিন্সিপ্যালের ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। সেই সিচ্যুয়েশনও তো নেই। আলনি কেন বডি গার্ড রাখছেন? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসব কি মানায়?

রায়চৌধুরী বললেন, আছে লখন থাক না। ক্ষতি কি পানটা সিগারেটটা এনে দেবে। বাজারটা বয়ে দেয়। ট্রেনে যখন যাই তখন আগে লাফিয়ে উঠে সিট রাখে। মাঝে মাঝে রান্নাও করে ভাল। দাসগুপতি অ্যাডবিনিস্ট্রেশনের বারোটা বাজালেও এই কাজের কাজ করে গেছে।

৩

অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেন ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা। তাঁর শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত কাটল শান্তিনিকেতনের ভূমিত্রীর লাবণ্যমাখা সুন্দরের সঙ্গ নিে গুদেবের সান্নিধ্য পেয়েছেন। সেকালের শান্তিনিকেতনের নানা টুকরো স্মৃতি ঝলসে ওঠে এই আশ্রমিক প্রত্তনের কলমে। সেইরকম এক ঝলক

তখন আমাদের আশ্রম ছিল যথার্থই আশ্রমের মতো। কি সাধাসেধে জীবনযাত্রা, এখনকার কেউ ভাবতেই পারবে না। সমস্ত কাজকর্ম নিজেদেরই কপতে হত। সমস্ত গুপল্লীতে দুটো মাত্র কুয়ো। সেখান থেকে নিজেরাই জল আনতাম। আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে পাশাপাশি নটি বাড়ি। বলা হত, ‘রবীন্দ্রনাথের নবরত্নের বাড়ি’। বাসিন্দারা হলেন - নন্দলাল বসু, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, প্রমদারঞ্জন, জগদানন্দ রায়, শব্দকোষের হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার বাব ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, গোঁসাইজী, আর ছিল মোহরেরা।

সমস্ত বাড়িই কিন্তু মাটির দেওয়াল, খড়ের চালের।

তিবিশের দশকে শান্তিনিকেতনের গুকুলের এই বর্ণনা এখন সরই অলীক। নতুন প্রজন্মের পাঠকদের জন্য শুধু অমিতা সেন-কথিত নামাবলিতে উল্লিখিত দুটি নামের ব্যাখ্যান দরকার। গোঁসাইজী বলতে তিনি বোঝাচেছন নিতাই বিনোদ গোস্বামীকে আর মোহর অর্থে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিবরণটি এখানে হাজির করবার কারণ হল, গুদেবের নবরত্নদের মতো বিশ্রুত ও পরিতিষ্ঠিত শিক্ষকদের সরল জীবনধারার সামান্য আভাস দেওয়া। এখনকার ঝিভারতীতে গেলে অধ্যাপকদের প্রাসাদপ্রতিম হর্ম্যবিলাস, তার স্থাপত্যের নন্দনতত্ত্ব, তার, উদ্যানচর্চা আর গ্যাজেটশোভিত রান্নাঘর দেখবার বস্তু বলে বিবেচিত হতে পারে। তাতে দোষ নেই - যে যুগের য মন্ত্র। তবে টোকা-মাথায়-দেওয়া সাইকেল আরোহী শিক্ষক যে নেই তা নয়, তবে তাঁদের কৃপন বলে কিঞ্চিৎ বদনাম হর্ম্যবিলাসীরাই দিয়ে থাকেন।

পরিমটা কিন্তু বাড়ি গাড়ির নয়, অ্যাটিটিউডের, বললেন একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। নামকরা মানুষ থাকেন এখন শান্তিনিকেতনে। মাঝে যান কলকাতার ডাকে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করতে, সেমিনারে। ঐ নগরীতেই তাঁর নামী অধ্যাপনার পর্ব কেটেছে। ফিরে চল্ মাটির টানে-জাতীয় আহ্বান তাঁকে শান্তিনিকেতনে টেনেছে শেষ বয়সে। নগরায়ণ ক্লান্ত, মানুষটি চেয়েছিলেন প্রকৃতির শ্যামল শুশ্রূষা। হা হতোস্মি, শান্তিনিকেতন এখন প্রাসাদপুরী, কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী। কোথায় যে যান অধ্যাপক! আমাকে বললেন একান্তে আমাদের জীবনের বারোআনাই দেখেছি লেখাপড়া জিনিসটা ছিল মধ্যবিত্তের কব্জায়। এখন তো সব বডলোকদের বাচছায় ভর্তি। গাড়িতে করে আজকাল কত কত ছাত্রছাত্রী কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে আসে, মানে বাব-মা বা ড্রাইভার ড্রপ করে দিয়ে য়ায় আবার কাউকে বিকালে নিয়েও যায়। আমাদের সময় কি বড়লোক সহপাঠী ছিল না? কলকাতার আর বাইরের সব বনেদী বড়লোক। হাতিবাগানের, ভবানীপুরের, এলগিন রোডের, বেহালার, উত্তরপাড়ার, ভূকৈলাশের। তারা তো সব বাসে ট্রামেই আসত। অধ্যাপকেরাও তাই ... ও হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল। গতমাসে কলকাতার একটা মেয়ে কলেজে (নাম বলব না) গিয়েছিলাম বক্তৃতা দিতে। অনুষ্ঠানের পর ভাবছি অধ্যক্ষ বোধহয় ট্যাক্সি ডাকবেন আমাকে পৌছেদিতে। ও মা, অবাক কান্ড, পাঁচদন অধ্যাপিকার একসঙ্গে ঝুলোঝুলি, ‘স্যার আমার গাড়িতে চলুন। একটা লিফ্ট দিই আপনাকে ।’ ইনক্রেডিব্ল্। ভাবতে পার অধ্যাপকদের সচছলতা আজ কোন্ পর্যায়ে পৌঁচেছে। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আবি মাত্র তিন হাজার টাকা পেনশন পাই। কী করে যে চালাই।

এটা ঠিকই যে পঞ্চাশের দশকে আমার ছাত্র জীবনে জানতাম না অধ্যাপকদের বেতনক্রম কত। কে লেকচারার, কে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কে প্রফেসর বুঝতাম না। স্কুল জীবনে তো শিক্ষক বলতে কেনও সুবেশ, প্রসাধিত বা রোজ ক্ষৌরিকরা ফিটফাট ব্যক্তিদের বুঝতাম না। শিক্ষকদের জীবনপ্রসঙ্গে আমরা শুনতাম বা পড়তাম, ‘তিনি অতঃপর দারিদ্রময় কিন্তু আদর্শবান শিক্ষকের ব্রত গ্রহণ করিলেন।’ সেই ব্রতবীরদের আমার বাবা দেখেছেন, আমার দাদারা দেখেছেন, আমরাও দেখেছি। সাদা টুইলের শার্ট বা পাঞ্জাবি, মলিন ধুতি, সস্তা জুতো, একটি জীর্ণ রংচটা ছাতা। কিন্তু কী দাপট! একটুও দীনতা নেই আচরণে। ক্লাসের মধ্যে পয়েল বেঙ্গল টাইগার। পড়া না পারলে রাম ধোলাই। ভাল রেজাল্ট কপলে সে কী আনন্দের হাসি! সেই সঙ্গে ছিল জাতীয়তাবাদের কৌশলী প্রচার, ইংরেদদের তাঁবেদারদের এড়িয়ে। কানাইলাল ক্ষুদিরামের গল্প, বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেরীর কথা, তাপসী বাবেয়া, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, বিংবা হাজি মহম্মদ মহসিনের দানশীলতা, গোবরবাবুর শরীরচর্চার বিবরণ। মোহবাগানে জয়ে পরাধীন দেশের মাস্টার মশাইয়ের চোখে জল -কারণ বিজিত দল সায়েবদের। স্কুলের প্রাইজ হবে তারজন্য একমাস ধরে গানের মহড়া দিচ্ছি অনিল স্যারের কাছে ‘শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান’। হার্মোনিয়াম বাজাতে বাজাতে অনিল স্যার বললেন, এই ফাঁকে তোদের আরেকটা গান তুলে দেব - ‘সর্ব খব্যতারে দহে তব ক্রোধদাহ’। জানিস গানয়া কার লেখা? শুভ কর্মপথের মতো এটাও রবীন্দ্রনাথের। বিপ্লবী যতীন দাস অনশনে যখন মারা গেলেন তখন এই লেখা। শোন্, আজ নাহয় কাল দেশ স্বাধীন হবেই - তোরা হবি সব নতিু স্বাধীন দেশের যুবশক্তি। তোদের গাইতে হবে, তোমার পতাকা যারে দাও শক্তি।

সেই শক্তি আর ভক্তিতে আজ কি হঠাৎ টান পড়ে গেল? মহান দুঃখ সইবার সেই প্রার্থিত সাহস কি উদ্ধৃত্ত রইল না স্বাধীন দেশে? সচছলতা কে না চায়? বেতনক্রমের পুনর্বিন্যাস তো হবেই। সেটা সব্যস্তরেই হচেছ, সব জীবিকাতেই। কাজেই শিক্ষকদেরও ভদ্রস্থ বেতন হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়, ন্যোয়ও নয়। কিন্তু গত ক’বছরে সব রকমের শিক্ষকদের সম্পর্কে আস্তে আস্তে যে সমাজের বেশ কিছু মানুষ ক্ষিপতি, অসূয়াগ্রস্ত, অসহিষুও হয়ে উঠল এর কারণ কি? শুধুই টিউশনী থেকে পাওয়া উদ্ধৃত্ত উপচিত অর্থের দেখনদারি? কই, সাবাই তো টিউশ্যনি করেন না। তা হলে?

তবে কি অ্যাটিটিউডে কেনও গোলমাল হল? শিক্ষাদানের পদ্ধতির মধ্যেই ঘুন? নাকি শিক্ষকদের মতিগতি গেছে পাল্টে? ছাত্রসম্প্রদায়ের বাস্তব বুদ্ধি, সুবিধাবাদ আর পলায়নী মনোভাবও কি কিছুটা দায়ী? প্রটা করা সহজ কিন্তু উত্তরটা তার জটিল। সদ্য শিক্ষকহয়েছে এমন একজন তণ আমাকে বলল, স্যার হুগলীর গ্রামের সয স্কুলে আমি গত সাত মাস মাস পড়াচ্ছি সেখানে স্টাফমে বসা যায় না। শিক্ষদের সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যায়। যাঁদের সঙ্গে কাজ করি তাঁরা বেশিরভাগই স্থানীয় বা আশপাশের নানা জায়গা থেকে আসেন বাসে বা সাইকেলে। অনেকেই সময়মত আদেন না। এলে, আলোচনা করেন কোন্ কোল্ড স্টোরেদে কে কতটা আলন রেখেছেন। আলনর দর এবারে কি বাড়বে? দুশ্চিন্তা সেটাই।

অব্যাপারেষু ব্যাপারম বলে একটা কথা আছ, কিছু কিছু শিক্ষকদের জীবনে সেটা একন সত্যি হয়ে উঠেছে। শিক্ষদেদের প্রধান কাজ ক্লাসে শিক্ষাদান। আগেকার শিক্ষকরা বেশিরভাগ তাই কপতেন। সবাই কিন্তু ভাল পড়াতেন না। কেউ কেউ শেক্ষকতা ছাড়াও যুক্ত থাতেন কোনও গ্রন্থাগারে বা খেলার মাঠে। কার নেশা ছিল ব্যায়াম করা ও করোনো, কার ছিল জিমন্যাস্টিকস্-এ প্রবণতা। বয়স্কদের জন্য নাইট স্কুল কিংবা স্কাউট আন্দোলনে শিক্ষকদের পাওয়া যেত। কার কার সংগঠন ছিল দরিদ্র ভান্ডার স্থাপন, মড়া পোড়ানো, রাত জেগে রাগির সেবা কিংবা সাইকেল চেলে ছাত্রদের নিয়ে কেনও দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ। শিক্ষকাদের অনেকে থাকতেন চিরকুমারী হয়ে, কেউ কেউ করতেন মহিলা সমিতি। বিধবাদের সেলাই স্কুল চালানো কিংবা নারী সদাজে শিক্ষা বিস্তার ও প্রগতি আন্দোলনে কেনক শিক্ষকা আগে দেখা যেত। এখন কম দেখা যায়। বালবাহুল্য এখানে আমরা শিক্ষক বলতে সবরকমের ক্যাটিগ্র বোঝাচ্ছি - প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও কলেজস্তরের।

এখন মানে গত দু’দশকে সব স্তরের শিক্ষকদের বেতন যেমন বেড়েছে তেমনই সরকার বেতন ও ভাতা দানের দায়িতবি নেওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে আত্মতৃপ্ত একরকম সচ্ছলতা এসেছে। হয়তো কমে গেছে দায়বদ্ধতা ও আত্মদামের সদিচ্ছা - যেন অনেকটাই নির্লিপ্ত তাঁরা, উদাসীন ও আত্ম-সর্বস্ব। সবাই নয় নিশ্চযই, কিন্তু অনেকে। শিক্ষকের স্বাধীনচিন্তার বদলে পরানুগ্রহের জন্য লোভাতুর সত্তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সস্তা জনাদরের লোভে ছাত্রদের মানোহরণের জন্য অনেকটাই নীচে নেমে যাচ্ছেন কেউ কেউ। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করে অনেকে নেতা বনে নানা অসম সুযোগ সুবিধা ভোগ কপছেন। আধিপত্যবাদ বেড়েছে, নিদেদের দল

াদলিতে শিক্ষার্থীদের জড়ানো হচ্ছে, অন্যতর কাজের অজুহাতে ক্লাস কামাই করা এখন জলভাত। আবার বলি সব শিক্ষক নন, অনেকেই নন এমন, কিন্তু বেশ কজনই একন এরকম। ফলে বদনাম হচ্ছ সামগ্রিকভাবে শিক্ষকশ্রেণীর। তাঁদের বাক্তিগত ঝািসযোগ্যতা কমে গেছে, তাঁদের সচ্ছলতাকে সমাজ ান্দেহের চোখে দেখে, তাঁদের আচরণ ও ভাষা অনেককে আহত করে। ক্লাসে না পড়িয়ে সবাই বাড়িতে টিউশ্যনি করে প্রচুর পয়সা কামাচ্ছেন এ-অপবাদ খুব আপাত স্তরের, হয়তো সার্বিক নয়, কেননা শতকরা আশিভাগ শিক্ষকই টিউশ্যনি করেন না এবং সেই আশিভাগ অর্থাৎ গরিষ্ঠ শিক্ষকরাই মন দিয়ে ক্লাশ নেন। অথচ বদনামের বাগ নিতে হয় তাঁদেরও। বেশিরভাগ কলেজেই যে একন বেলা দুটো-আড়াইটার পরে শিক্ষার্থীরা থাকে না সেকথা তাঁরা কাউকে জানাতে পারেন না। প্রা ওঠে পড়াবেন কাকে ? আদর্শবান শিক্ষকীখন চোখের সামনে দেখেন পরীক্ষার হলে অন্য কলেজের পরীক্ষার্থীরা (কারণ এখন হোম সেন্টার নেই) টোকাটুকি কপছে এবং ছাত্র সংসদ তাদের স্পষ্ট মদত দিচ্ছে তখন আদর্শ কেন্ কাজে লাগে? পরীক্ষার হলে অসদুপায় গ্রহণকারীদের হাতে নাতে ধরে ফেলার অপরাধে শিক্ষকের প্রহৃত হবার ঘটনা কি আমরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়িনা? সমাজ তার কী প্রতিকার করেছে? ফাঁকিবাজ অসৎ শিক্ষকদের চিহিত করে কোনও শিক্ষক সমিতি বা সংগঠন কি নিন্দা প্রসাতাব নিতে পারে? এসব দিক থেকে বাবলে মনে হয়, হঠাৎ সম্প্রতি সব শিক্ষকদের একযোগে যে কাঠগড়ায় তুলে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তাঁদের অসহায়তার প্রতিকার কি ? সমাজের সব কিছু ঠিক আছে, সবাই সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ, কেবল শিক্ষকরাই চোর দায়ে ধরা পড়লেন?

শিক্ষকদের চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে অনেক জিনিস দেখতে পাই, তার কারণ আমার কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী এখন শিক্ষকতা করে। প্রথমেই খবিদ্দিনের কথা বলি। সে তার গ্রমের কাছাকাছি একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। স্কুলের পরিচয় একটা মাদার গাছের তলায় ভাঙা কুঁড়ে ঘর ও দাওয়া। তাতে ঘর ও দাওয়ায় চারটি শ্রেণী পড়ে, সাকুল্যে দুশো আড়াইশো ছাত্র। শংকিত হয়ে বলি, কোথায় বসে তোমার ছাত্ররা?

খবির বলে, তার আগ স্কুলের নাম শুনে নিন। নাম হল শকুনতলা ইস্কুল। গ্রামের সবাই তাই বলে।

শকুনন্তলা স্কুল? কেন এমন নাম?

শকুন তলা স্যার। মানে, গ্রামেরএকেবারে প্রান্তে নদীর ধারে মাদার গাছে থাকে বেশ কটা শকুন, তাই শকুন তলা। তারা সমস্ত জায়গাটা হেগে নোংরা করে রাখে। তার নিচে ঘরের মধ্যে দুজন টিচার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ক্লাস ওয়ান আর টু-কে পড়ায়। একঘরে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশোজন তো বটেই কিংবা একেকদিন তার বেশি। বাইরে শকুন তলায় ক্লাস থ্রি আর ফোর।

ঝড় জল রোদে?

হ্যাঁ, যতক্ষণ সম্ভব। যতটা সম্ভব। নইলে ছুটি দিয়ে দিতে হয় সেদিনের মতো। এবারে ছাত্রদের কথা ব্ল। বেশিরভাগই আসে না, ধরে আনতে হয়। ফসল রোওয়া বা কাটার সময় তারা বেশিরভাগ মুনিষ খাটে। ক্লাস ফোরে হয়তো বললাম ‘ভাগ কর ১৬ () ২০০০’। ছাত্র খাতায় লিখে নিয়ে আনল ভয়ে আকার গ অর্থাৎ ভাগ শব্দটা। ভাগ চিহ্ গুণ চিহ্ কিছুই চেনে না।

পাশ করল কী করে?

পাশ করেনি তো! তুলে দিয়েছি উচুঁ ক্লাসে - ক খ গ মূল্যায়ন কেউ বোঝে না। তারপরে ক্লাস ফোরে বিশেষত মোয়েরা ডাগর হলে খুব বেমানান দেখালে প্রমোশন দিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হত বলি ক্লাস ফাইভে। চলে যায়। আমরা তো বাঁচি।

মুকুলিকা স্কুল সার্ভিস কমিশনের মোহরছাপ পেয়ে গত বছর শহিদ কানাই লাল উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেয়েছে। মিস্টির প্যাকেট নিয়ে এসে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইল। তারপরে আবার এল প্রায় পাঁচ মাস পরে পুজোর শেষে বিজয়া করবে। বললাম চেহারা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। স্কুলে খুব ধকল নাকি?

স্যার স্কুলের চাকরি এত কষ্টের জানতাম না।

কেন?

স্যার, কত যে স্টুডেন্ট। জানেন তো এখন গ্রামাঞ্চলে হেয়েদের লেখাপড়ার খুব ধঊম পড়ে গেছে। একটা ঘরে একই সঙ্গে এইট আর নাইনের ক্লাশ হচ্ছে, ভাবুন। আমি পড়াচ্ছি ইতিহাস ক্লাস নাইনে, করবীদি পড়াচ্ছেন বাংলা ক্লাস এইটে। দুজনেই তারস্বরে চেঁচাচ্ছি। তারমধ্যে মেয়েদের কথাবার্তা-বকুনি। স্কুল তেকে যখন ফিরি - শ্রান্ত ক্লান্ত, গলা বসে যায়।

অমর্ত্য সেন প্রথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে যে সব প্রতিবেদন পেশ করেছেন তাতে ভদ্র পঞ্চজনের চোখ গোলা গোলা হয়ে গেছে। আমার মতো যারা গ্রামে গ্রামান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি গত তিন চার দশক তাদের ঝুলিতে যে কত বেড়াল! আমার মুক্তমন উদারমনস্ক প্রাক্তনছাত্র সাহেবালি মন্ডল নদিয়ার এক মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে মাধ্যবিক স্কুলে পড়ায় - নিন্দু মুসলিম যুক্ত চৈতন্য সম্পর্কে সে স্বপ্ন দেখে - বাউল ফকিরদের গান সংগ্রহ করে সে আমাকে এনে দেয়। তার স্কুল পরিবেশেই অনেকে তকে সন্দেহের চোখে দেখে। নিপাট মুসলিম গ্রাম। চারশো ছাত্র পড়ে। প্রধানশিক্ষক বাদে তারা মোট সাতজন - সবাই মুসলিম। স্টাফমে তাকে স্পষ্ট বলা হয়েছে, তোমার আচার আচরণ পালটাও। তুমি রোজ নামাজ পড়? এবার রোজা রেখেছিলে? রাখোনি? তাহলে আর লেখাপড়া শিখে তোমার কী লাভ হল?

সত্যিকারের ভাল মানুষ সুব্রতা দা, মানে আমাদের শহরের সুব্রত বাগচী প্রধান প্রাথমিক শিক্ষক। স্থানীয় ডোমপাড়া জি. এস এফ. স্কুলে হেড মাস্টারি করছেন বহুদিন। জি. এস. এফ. মানে গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড ফ্রি প্রাইমারি স্কুল। মাইনে পান নিয়মমত, তবে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় মতিগতি কম। অনুন্নত এলাকা। সঙ্গে আছেন একজন সহকারী শিক্ষক, এক দিদিমণি। একটা বারান্দাঅলা দুঘরের পাকাবাড়ি। দুখানা ঘরে চারটে ক্লাস। মাস্টারমশাইয়ের বসার জায়গা ঐ খোল বারান্দা, অবশ্য ছাদ আছে। ঐ খানেই আছে একটা আলমারি। পাড়ার লোকই বরাবর রক্ষা করে চেয়ার টেবিল আলমারি। পাড়ার কেউ কেউ শিক্ষকদের সম্ভ্রম করে, অনেকেই তো প্রাক্তন ছাত্র - ড্রপ আউট অবশ্য। বলে, ‘মাস্টারমশাই অসুবিধে হলে বলবেন। সবাই তো সমান নয়। কেউ কেউ শুনিয়ে শুনিয়েই বলে, ‘দুটি পাতা একটি কুঁড়ি - দুই মাস্টার আর এক দিদিমণি। আছে বাল। আসছে যাচ্ছে, আড্ডা মারছে, একটু আধটু পড়াচ্ছে - ব্যস, মাস গেলে মোট টাকা।’

সুব্রতাদারা বিব্রত হন, অপমামিত বোধ করেন - বয়স হয়েছে তিনজনেরই - সয়ে যান। ভাবেন, কবে যে রিটায়ার করে বাঁচবেন! এভাতেই চলছিল, হঠাৎ একদিন সুব্রতদা দেখলেন স্কুলের বারান্দায় পয়েছে নোংরা কত কি আর গাঁজার কলকে। ঝাঁট দিয়ে তবে স্কুল শু হল। প্রধান শিক্ষক হলেন ঝাড়ুদার। তবু শিক্ষকতার মহান বৃত্তির কথা তো ভুললে চলবে না। অচিরে এভাবে একদিন ঝাঁট দিতে হল মদের পাঁইট, মাংস মাখানো শালপাতা, বিড়ি দেশলাই কাঠি। আলমারিটার পাল্লা ভাঙা। পাড়ার লোকদের দ্বারস্থ হতে হল, তারা প্রাক্তন ছাত্র, কিন্তু মিনমিন করে বলল, মাস্টারমশাই আমাদের আজকাল কিছু করবার নেই। নিপায়। ওরা উঠ্তি মাস্তান। কিছু বললে বোমাবাজি করবে কিংবা আপনাদের খিস্তি দেবে। সত্যি কথা বলতে কি, এ ছাতার ইস্কুল রেখে লাভটাই বা কী?

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা - হতাশ সুব্রতদা স্কুলবোর্ড অফিসে তদ্বির করে বছর খানেকের নাজেহাল চেষ্টায় বদলি হলেন শহরের একেবারে প্রান্তবর্তী এক স্কুলে। আমাকে দুঃখ করে বললেন, ডোমপাড়া ইস্কুলটা বলতে গেলে তো নিজে হাতেই গড়ে তুলেছিলাম, তাই মায়া লাগে। নিজের পোঁতা নিজেই তুলে ফেললে কেমন লাগে বল তো? মানুযেরই দরদ নেই। শিক্ষকদের ওপর ভরসা নেই। এই পায়ে-মারি শক্ষার কী যে হবে!

কী বললেন? পায়ে মারি শিক্ষা?

হ্যাঁ, ম্লান হেসে সুব্রতদা বললেন আমরা নিজেরা এই শব্দটা বানিয়েছি। প্রইমারি নয়, পায়ে মারি। খুব ছোটবেলায় এমন করে পায়ে মারতে হবে যাতে ছেলেমেয়েগুলো আর উঠে দাঁড়াতে না পারে।

শিক্ষাজগৎই যে কেবল পায়ে মারে তা তো নয়, প্রবেশ পবিস্থিতিও আঘাত হানে। সুব্রতদাকে ডোমপাড়ার নব্য মাস্তানরা যেমন স্কুলছাড়া কপল তেমনই অকণ আচরণ অন্যত্রও দেখেছি। যেমন ধর্মদার কাছে কাকপলসা গ্রামে দেখেছিলাম অদ্ভুত এক দৃশ্য। ওখানকার প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার বিপুলচন্দ্র ব্বিাস, আমার পুরোনো ছাত্র। তার গ্রামে গিয়েছিলাম একজন বাউলের সন্ধানে। খবর পেয়ে বিপুল এসে নিয়ে গেল খাতির করে তার বাড়ি। দুপুরে খেতেও হল। তারপরে বললাম, তোমাদের স্কুলটা দেখাবে না? লজ্জিত হেসে বলল, গাঁয়ের ইস্কুল - কীই বা দেখবেন? তুব চলুন। আপনি একজন শিক্ষক, তায় আমার সাক্ষতৎ শিক্ষগু - দেখে যান কেমন প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করি আমরা।

বিপুলদের স্কুল ঘরটা পাকা, খানিকটা মাঠও আখে, তবে দুটি ঘর বড়ই জীর্ণ। ছাত্রদের চাপ আছে, কিন্তু অভিবাবকরা উদাসীন। বিপুল পাশের গ্রামের ছেলে কিন্তু বহু চেষ্টা করেও স্কুলঘর সংস্কার করার জন্যে একপয়সা চাঁদা তুলতে পারেনি। সদরের ডি-আই অফিস আর সাব ইনসপেকটরদের এত দুর্গম গ্রামদেশ সম্পর্কে নেকনজর থাকবার কথা নয়। শিক্ষকদের প্রধান লক্ষ্য চাষবাস। নাম কা ওয়াস্তে একবার হাজিরা দিয়ে তাঁরা যান জমিতে জল দেবার জন্যে ডিপ টিউবওয়েল অপারেটরদের তোয়াজ করতে। তারপরে মর্জিমতো ক্লাশ নেন। বিপুল একা কি করবে? একজন শিক্ষক অঞ্চল সদস্য - তাঁকে কিছু বলা তো অসম্ভব, মিটিং আর সংগঠনে সদাব্যপ্ত। তবু বিপুল আমাকে নিয়ে যায় তার জীবিকাস্থলে। শ্রীহীন, ছাড়া ছাড়া কেমন যেন পরিবেশ। ছাত্ররা চারদিকে ভ্রম্যমান। বিপুলকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরে আর দাওয়ায় তারা বসে পড়ে। প্রচন্ড কলকোলাহল। স্যাররা নেই আপাতত। বিপুলকে বললাম, দুখানা মাত্র ঘর, তার এক খানায় তালা দেওয়া কেন? বিষণ্ণ কণ্ঠে বিপুল বলল, গ্রামের একদল শক্তিশালী মানুষ অধিকার নিয়ে তালা মেরে দিয়েছে। চাবি ওদের কাছেই। ঘরের মধ্যে স্যার উঁকি দিন - তাহলে বুঝবেন। ঘরের একটি জানালার পাল্লা খোলা ছিল। প্রায়ান্ধকার ঘরে উঁক দিয়ে চোখে পড়ল মেঝেতে গাঁথা মস্ত একখানা উনুন। কী ব্যাপার? এত বড় উনুন কেন?

গ্রামে আজকাল অষ্টমপ্রহর হরেকৃষ্ণনাম আর কেইসঙ্গে অন্ন মচ্ছব প্রায়ই হয়। এই ঘরে ঐ ঢাউস উনুন সেই প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যাদানের চেয়ে হরিনাম অনেক জরি নয় কি? আসলে স্যার গ্যামের পরিবেশ এখন অন্যরকম। আমরা শিক্ষকরা যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছি।

এমন হতাশ নিদ্যম বিষণ্ণ মানোভাব সারা দেশের শিক্ষাব্রতীদের তিলে তিলে ক্ষয় করে দিচ্ছে হয়তো। আমার একজন অনুরাগী পাঠক চাকরি করে হুগলীর একটা গ্রামে। তার নাম সুজন ভট্ট। সুজনের বাড়ি বৈদ্যবাটি। সেখান থেকে খুব সকালে সাইকেলে করে পৌঁছায় স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেন চেলে শ্যাওড়াফুলি পৌঁছে আরেকটা ট্রেন ধরে তারকেশ্বর লাইনে তার কর্মস্থলে পৌঁছয়। হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সে লাইফ সায়েন্সের টিচার। অতান্ত কর্মনিষ্ঠ এবং সফল শিক্ষক। ফাঁকি দেবার কোনও প্রবণতাই তার নেই। বৈদ্যবাটিতে তার সাবেক বাড়ি। বাড়ির সদস্যরা বেশিরভাগ বয়স্ক ও অসুস্থ, তার নিজের সন্তান পড়ে স্থানীয় ভাল একটা স্কুলে। কাজেই বৈদ্যবাটি থেকে পরিতিদিন তাকে কর্মস্থানে যেতে হয়। ভোর সাড়ে চারটে বাড়িতে শু হয় তার তৎপরতা। প্রতিক্ষণই তাকে ঘড়ির কাঁচার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই চালাতে হয়। এইভাবে দ্ধ নিশ্বাসে দুটো ট্রেন চেপে তারপরে বাস থেকে নেমে যখন হেঁটে স্কুলের মেটে রাস্তা ধরে তখন গ্রামে একটা বটগাছতলায় কিছু ব্যক্তি তাকে প্রাবানে বিদ্ধ করে। এ সব ব্যক্তির শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে কোনও যোগ নেই, তবে অঞ্চল রাজনীতির স্বঘোষিত মুবিব। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত, চল্লিশ পেরনো বয়স। পরনে লুঙ্গি আর টি-শার্ট, পায়ে রবারের সস্তা চটি। বটগাছ তলায় একটা বাঁশের বড় মাচায় বসে তারা সারাক্ষণই লেঠুগিরি করে। স্কুলমুখী এস্ত সুজন ভট্টদের তারা থামিয়ে জিগ্যেস করে   কি মাস্টার এলে? তারপরে কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখে বলে, হুঁ। সময় মতোই এসেছে। ভালো। রোজ তাই আসবা!

রাগে হাড়পিত্তি জ্বলে যায় সুজনদের, নিদের ভাগ্যকে দোষে, তবু হাসিমুখে চেয়ে থাকে মুবিবদের দিকে। এরা স্কুলের কেউ নয় কিন্তু আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাশালী - পুলিশ এদের দোস্ত। মাঠে ঘাটে গ্রামে যে গণধোলাইয়ে হত্যার খবরআসে তার প্রধান হননকারী এরাই - পরে গা ঢাকা দেয়। তাই শিক্ষকদের খবরদারি তারা করতেই পারে। সুজনদের তারা প্রায়ই হেসে বলে, শোনো মাস্টার, মন দিয়ে পড়াবা। একদম ফাঁকি দেবা না। বুঝলে? মনে রাখবা, এই গ্রাম থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছ।

একজন বুঝি বলে ফেলেছিল, আপনাদের টাকা কেন বলছেন? আমাদের মাইনে তো সরকার দেয়।

তাদের একজন মাচা থেকে নেমে এসে শিক্ষকের নাকের ডগায় তর্জনী উঁচিয়ে বলেছিল, চোপ্। একটাও কথা বলবা না। টাকা সরকারের কি তোমার বাবার সেটা আমরা বুঝবো। চাকরি করতে এসেছ চাকবি করবা। ব্যস। নইলে ...

একটু খে যুবক শিক্ষকটি বলেছিল   নইলে? নইলে কী?

নইলে ঐ পা দুটো খোঁড়া করে দেব। চিরকালের মতো।

সবাই বলবেন এসব ব্যতিত্রম। আবি তর্ক কবর না। কন্তি সারাদেশে শিক্ষক্ষেত্রে কতরকম যে মাস্তানী হচ্ছে তার খবর রাখা মুস্কিল। শিক্ষকদের অপমান করা এখন একটা ব্যাপক রেওয়াজ। নানাভাবে তার প্রকাশ চোখে বড়ে। ট্রেনের কামরায়, ক্যান্টিনে, বাসে, নেতাদের ভাষণে কান পাতলে বহুতর শিক্ষক বিদূষণ দেখি - যার কোনও প্রতিবাদ দেখিনা, প্রচ্ছন্ন সমর্থনই দেখি সাধারণত। অথচ আমার মনে পড়ে কত ত্যাগী বা ব্রত শিক্ষকশিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের আন্তরিকতা - ক্লাশে এবং ক্লাশের বাইরে। সুজন ভট্টদের মতো নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের যেমন অপমান ও অনাদর সয়ে কাজ করতে হয় তেমনই অন্যধরনের বহু শিক্ষকের নীরব উদ্যম সমাজে স্বীকৃতি বা সম্মান পায় না। এমন একজন মানুষ বন্দীপুরের কানাবাবু। চাকরি থেকে অবসর নিয়েও শিক্ষকতা ছাড়েন নি। তাঁর বাড়ির অনতিদূরের পতিতাপল্লীর সন্তানদের রোজ বাড়ি এনে পড়াতে বসেন। তাঁর স্ত্রী আর ছেলে এতে বিরত্ত হন। তাই পতিতাপল্লীর কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছেন। সেখানেই পড়ান এবং স্বপাকে রেঁধে মাঝে মাঝে বাড়ি যান - প্রতিবেশীরাও সন্দেহ করে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ।

আমি অন্তত ভুলতে পারিনা, বরং কৃতজ্ঞ বোধ করি, জানা অজানা কত শিক্ষাব্রতীদের কথা ভেবে। এমন দুপাঁচজনকে চিনি যাঁরা লেখাপড়া শেখান পথশিশুদের, হরিজন বস্তিতে কিংবা আদিবাসীদের গ্রামে। কোনও উপকরণ নেই, ক্লাশম নেই, কিন্তু উদ্যম আছে, দরদ আছে, আছে স্বপ্ন। অন্তত চারজন মুসলিম যুবককে জানি যংারা মৌলবাদী মোল্লাদের খপ্পর থেকে ধর্মের পাঠ না- নিয়ে আধুনিক শিক্ষার যুক্তিবাদের দিকে টানছেন স্ব-সম্প্রদায়ী যুবকদের। নসরৎগঞ্জের আম্বিয়া বেগমকে জানি, যিনি তাঁর অন্দর মহলে সারা দুপুর পাঠ দেন অন্তঃপুরবাসিনী মুসলিম তউ ঝিদের এবং মনে পড়ে শ্রীপদ প্রামাণিক মশাইকে। তাঁর কথা আলাদা করে বলবার মতো।

মানুষটি এখন আর বেঁচে নেই কিন্তু সারাজীবন ভাবি আশর্চর্যভাবে বেঁচে ছিলেন, যা খুব কম মানুষই পারে। সবচেয়ে বড় কথা, কারার সম্পর্কে শ্রীপদ বাবুর কোনও অভিযোগ ছিলনা। জন্মেছিলেন প্রামাণিক বংশে, এক অনামা গ্রামে। সেখানে শিক্ষার বিকিরন তেমন ছিল না। নিতান্ত নিজস্ব মেধায় পাশ করেছিলেন ম্যাট্রিক। গ্রাম্য যাত্রা, বাউল গান, ফকিরি তত্ত্ব এই সবে নেশা ছিল। দারিদ্র্যের কারণে ম্যাট্রিকের পর কলেজে পড়তে পাননি। একজন মুবিবর অনুগ্রহে পেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষাকের সামান্য চাকরি। তেমন কেনও তড় উচ্চাশা ছিল না। সাধারণ ঘরে বিয়ে করেছিলেন, গোটা চার-পাঁচ সন্তান হয়েছিল। তিন ছেলে দুই মেয়ে। দুখানা খড়-ছাওয়া মেটে ঘর, একটু বারান্দা, উঠোন - সামনে অবারিত এক নদী। গ্রামের পাঠশালায় সামান্য বেতনে শিক্ষাকতার ব্রত। সম্মান প্রতিষ্ঠা কিছুই নেই - সবাই বলতে

গেলে কণাই করত। কিন্তু দুরন্ত ছিল তাঁর পাঠস্পৃহা। বড়ছেলে দূরের শহরে গিয়ে কলেজে পড়ত। তার বইপত্র পড়ে আই. এ. পাশ কপলেন প্রাইভেটে - ছোট্ট গ্রামে একটু চাঞ্চল্য ঘটল। একইভাবে বি. এ. পাশ কপলে অনেকে নড়েচড়ে বসল। ছিরিপদ মাস্টারের তবে তো এলেম আছে। ছোটখাট শান্ত মুখচোরা মানুষটার মধ্যে এতটা জেদ আছে কেউ জানত না।

শ্রীপদ-র নেশা ছিল কিন্তু অন্য কাজে - যেটা বড় একটা কেউ জানত না। মাঠে মাঠে কোথায় যেন চলে যেতেন। লোকে ভাবত ঘুরনবাই - ঘরে মন টেকেনা। আসলে চলে যেতেন গহীন সব গাঁয়ে ফকিরদের সঙ্গ করতে। ফকিরিতন্ত্র খুব গোপন সাধনা - তাঁরা কাউকে কিছু জানান না। দমের কাজে নিবিষ্ট থেকে মাঝে মাঝে জিকির দেন। আত্মাতার একেবারে ভেতরে গিয়ে তাঁদের ‘ফাঁনা’ হয়ে যেতে হয় এবং সেই ফানা অবস্থায় স্থায়ী অবস্থান বা ‘বাঁকা-ই’ তাঁদের লক্ষ্য। শ্রীপদ তাঁদের সঙ্গে থেকে, পদসেবা করে, নানাভাবে আস্থাভাজন হন। তাঁদের কাছ থেকে, একটা জাব্‌দা খাতায় লিখে নিতে থাকেন নানা ফকিরি গান - বুঝে নেন গূঢ় মর্মার্থ। এদিকে গ্রামে তাঁর সেই একই পরিচয় - ছিরিপদ মাস্টার। লোকে বলে, মানুষটার হল ঘুরন বাই আর বইয়ের নেশা। বড়ছেলে বি. এ. পাশ করে চাকরি করতে চলে গেল। শ্রীপদ কিছু নোটপত্র জোগাড় করে বই ঘেঁটে ইসলাবি ইতিহাসে এম. এ. পাশ করে গেলেন প্রাইভেটে। সবাই বলল, মাসচার এবার সদরে গিয়ে ডি. আই অফিসে জানাও। এত জ্ঞানী পন্ডিত তুমি, তোমার কি ঐ গাছতলায় বসে প্রাইমারি মাস্টারি করা চলে? তুমি হাইস্কুলে হাসতে হাসতে কাজ পাবে। শ্রীপদ মিটিমিটি হাসেন। বলতে পারেন না যে ফকিরিতত্ত্বের দুর্লভ পরশমণি তংার দখলে - আর কত গান।

এই গানের সূত্রেই শ্রীপদ প্রামাণিকের সঙ্গে আমার আলাপ শেওড়াতলার অম্বুবাচীর মেলায়। অম্বুবাচীতে বৃষ্টি হবেই। সারাদিন উলঝরন জলের পর বিকেলের দিকে আকাশ সবে একটু ধরেছে, তখন পৌঁছলাম রানাবন্দ পেরিয়ে শেওড়াতলায় আহাদ ফকিরের সাধনপীঠে। এই শেওড়াতলা, তাই নানা বর্গের বাউল ফকিররা আসেন। বাংলাদেশ থেকেও বড্যার পেরিয়ে চলে আসেন উদাসীন সাধকরা, তাঁদের কেনও পাশপোট ভিসা লাগেনা - কণ্ঠের গানই তাঁদের পারানির কড়ি। ‘ফকিরদের আসর আর তাতে ছিরিপদ মাস্টার থাকবেন না তাই কি হয়?’ বললেন একজন উদ্যোক্তা, ‘এসে পড়বেন সন্ধ্যের মধ্যে। সম্বৎসরই আসেন। জানেন যে গান শু হবে রাত আটটা থেকে চোপর রাত।’ উদ্যোক্তার কণ্ঠে সম্ভ্রম ভরা ভঙ্গিতে আরও জানা গেল শ্রীপদ খুব হাঁটতে পারেন। ফকিরি গানের খোঁজে সব কাঁহা কাঁহা গাঁয়েগঞ্জে ঘোরেন। আশ্চর্য যে, এতদিন এত বাউল ফকিরের সঙ্গ করেও শুধু শ্রীপদবাবুর বাঁশি শুনেছি, চোখে দেখিনি। কারণ উনি তো মেলামচ্ছবে বড় একটা যান না, খুব ভীড় বড্ড কোলাহল সেখানে। কিন্তু একজন বলেছিলেন, আহাদ ফকিরের থানে অম্বুবাচীতে তিনি যাবেনই - সিদ্ধপীঠ বলে কথা।

সত্যিই সেখানে দেখা মিলল। বিনয়নম্র আচরণ, খুব লাজুক, মুখচোরা। মধ্যরাতে গানের আসরেরর একপাশে বসে একটা খাতা খুলে চর্টের আলো ফেলে গান মেলাচ্ছিলেন বোধহয়। আগেই আলাপ হয়েছিল সন্ধ্যেবেলা, তাই সরতে সরতে তাঁর পাশে এসে বসে বললাম, যে গানটা হচেছ সেইটা খাতায় আছে কিনা দেখছেন তো?

হ্যাঁ, সঠিক বলেছেন, তারিফচোখে আমার দিকে চেয়ে শ্রীপদ বললেন, এ-গানা জালালুদ্দিনের, সবাই বলে জালালা। নাম শুনেছেন?

না। কোথাকার মানুষ? এদিককার?

না না, পূববাংলার। ময়মনসিং নেত্রকোনায় অনেক বড় বড় মুসলিম সাধক, পীর ফকির আলি আউলিয়া জন্মেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহান এই জালাল খাঁ। ওদেশে তিন খন্ডে বেরিয়েছে ‘জালাল গীতিকা’। সংগ্রহ করা কঠিন। খবর পেয়েছিলাম আহাদের মেলায় এবার ওপারের একজন বড় গাহক আসবেন। তিনিই এখন গাইছেন জালালের গান। দেখছি গানটা আমার আছে। এ-গানটা পেয়েছিলাম করিমপুরের কাছে গোরড়াঙ্গা গাঁয়ে মোসলেম ফকিরের কাছ থেকে - ওপার থেকে শিখে এসেছিল।

এরপরে শ্রীপদ মাস্টারের সঙ্গে আলাপ জমতে দেরি হয়নি। পরের দিন সকালে মুড়ি খেতে খেতে অনেক কথা হল। সগর্বে সাইড ব্যাগ খুলে দেখালেন তাঁর অমূল্য সঞ্চয় - কত যে গান। পাশে পাশে তার ভাষ্য লেখা। ওগুলি ফকিরি ব্যাদা। বললাম, আমাকে দেবেন? চোখেমুখে কৌতুকের হাসি খেলে গেল। বললেন, ট্যানটালাসের গল্প জানেন তো? আপনার দশা হবে সেইরকম। গান আর গান, কিন্তু কিচছু বুঝতে পারবেন না। ফকিরি গান কি সোজা? উসলামি তত্ত্ব জানেন? মারফতি সাধনা বোঝেন? লা-মাকান জানেন?

না, ভাসা ভাসা জানি।

ফকিরি তন্ত্রে বাসা ভাসা বলে কিছু নেই। একেবারে ডুবজলে অতল ঝাঁপ। আমি গত কুড়ি বছরেই থাই পাইনি। শিক্ষা কি অত সোজা? শিক্ষক পাওয়া এরক রকম ভাগ্যে বলতে পারেন।

গ্রামের প্রাইমারি শিক্ষকের সামনে অধোবদন একজন এম. এ, পি. এইচ. ডি।

পাঠক, শিক্ষাসংত্রান্ত বলেই কিনা কে জানে, এই লেখাটা বড্ড গোমরামুখো হয়ে যাচ্ছে, তাই একটু হাল্‌কা করি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কলেজে মাস্টারি করে যেমন আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তেমনই শুনেছিও অনেক। প্রথমে ওখানে শোনা দুটো ঘটনা বলি। প্রথমটা আমাকে বলেছিলেন একজন শিক্ষক। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। গল্পের মতো করে বলি।

প্রমথেশ মান্না একজন ঠিকেদার। কলকাতার ছোটমাপের উন্ডাস্ট্রিতে সাপ্লাইয়ের কাজ করে তংার হাতে খড়ি। ইঞ্জনিয়ারদের ঘুষ দিয়ে সরকারি কাজ পাওয়া তার দ্বিতীয় ধাপ। বিদ্যুৎ পর্ষদ্ সারাদেশে বিস্তৃত হচ্ছে তাই গ্রামে গঞ্জে টানা হচ্ছে লাইন। তাতে নানা খুচরো কলকব্জা লাগে। কেরানি, অ্যাকাউনাটস ক্লার্ক ও সাব অ্যাসিসচ্যান্ট ইঞ্জিনিয়াদের সঙ্গে বখরা করে প্রমথেশ এবার পাখা মেলে দেয়। অফিস খোলে, সুশ্রী কন্যা রাখে রিসেপশনে, কমপিউটার বসায়, ঠান্ডা ঘর বানায় কিছু দালাল ও মস্তান পোষে। অসম্ভব দুঃসাহসী এবং নির্বিকার রকমের অসৎ বলে তার ব্যবসা রমরমিয়ে ওঠে। এটা তো এখন সবাই জানেন যে, কলকাতা যত গায়েগতরে বাড়ছে, ততই বাড়ছে ফড়ে, দালাল, মস্তান, কাটমানি খাবার ঠিকেদার। তাদের তালে নিজের লয়কে বেঁধে হাওড়ার ঘুষুড়ির সন্তান প্রমথেশ প্রথমে শালকিয়ায় একটা বাড়ি করে এবং দুটো গাড়ি। একটা গাড়ি উঞ্জিনিয়ারদের ও তাদের বউদের পরিষেবায় সারাদিন ও সন্ধ্যেয় নিয়োজিত থাকে। বিল পাশ ও পেমেন্ট অসুবিধে হয় না। কোম্পানী বড় হতে থাকে। যোধপুর পার্কে আরেকটা বড় ফ্যাট কিনে প্রমথেশ মান্না ক্যালকেসিয়ান বনে যান। ক্লাব কালচার, রোটারিয়ান ও আসব বানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রমথেশের একটিই কন্যা - সুচন্দানা। গড়িয়ে গড়িয়ে হাওড়া গার্লস থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছিল। এরপরে আমার বন্ধু সত্যব্রত-র কাছে প্রাইভেটে এম. এ-র তালিম নিতে থাকে। তখনও প্রইভেট টিউশ্যনির ওপর পাবলিকের বিষদৃষ্টি পড়েনি। সত্যব্রত (নামটা বদলে দিয়েছে) কেনও একাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, বাংলা অধ্যাপক, বাজারে টিউটর হিসাবে নির্ভরযোগ্য। তার কাছে অগা বগারা পড়ে প্রাইভেটে প্রি. লি পাশ করে, তারপরে ফাইনাল এম. এ। সত্যব্রত-র নোটস্ কথা বলে, তাই তার কাছে পড়া মানে সিওর সাকসেস। প্রমথেস মান্নার অ্যামবাসাডর সত্যব্রতকে তার

বিজয়গড় কলোনির ফ্ল্যাট থেকে তুলে আনে যোধপুর পার্কে - পৌঁছেও দেয়। চকচকে নোটে পুরো দু'হাজার টাকা বেতন লেতে তার কেনও দিন দিগদারি হয়নি।

ঔ আখ্যান তার প্রত্যাশিত পথেই এগোতে থাকে, অর্থাৎ সুচন্দা প্রাইভেটে এম. এ পাশ করে যায়। কিন্তু তার বাই জাগে ডক্টরেট হবে। তার বালি প্রমথেশ মান্নার পক্ষে অসাধ্য বলে কিছু নেই - তাই সরাসরি একদিন রাতে নেমন্তন্ন করে সত্যব্রতকে প্রস্তাবটা দেন। সত্য সিউরে ওঠে। 'ড. সুচন্দনা মান্না' লেখা একটা কলিতে নেমপ্লেট তার বিবেককে ঝাঁকি দেয়। মন বলে এ অসম্ভব এ অসম্ভব। ডিনারটা মাটি হয় - হাজার পঞ্চাশ টাকা, চাই কি এক লাখ পাওয়া কেঁচে যায়। সে ভয়ে পালিয়ে আসে পালিয়ে আসে - কী সর্বনাশ, প্রমথেশ মান্নার করলার থাবা নাটবল্টু আর প্রমোটারের জগৎ থেকে সরে এবারে পি. এইচ. ডি পাড়তে চায় ?

এক সপ্তাহ পরে আবার ডিনার এবং মান্না-র সগর্ব ঘোষণা মাস্টারমশাই, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অমুক ইউনিভার্সিটির লেকচারারের বেকার ছেলেটাকে আমার কোম্পানিতে নিয়ে নিচ্ছি - বুঝলেন কিছু ? ঐ লেকচারার সুচন্দার থিসিসটা লিখে ডক্টরেট পাইয়ে দেবেন। আপনার সততা নিয়ে আপনি থাকুন।

এ কাহিনীর পরিণাম অবস্য বেশ স্বস্তিকর - কারণ সুচন্দনার ডক্টরেটের স্বপ্ন অচিরে ফেটে যায় এবং প্রমথেস মোটা টাকা দিয়ে একজন এন. আর. আই কিনে তার ঘড়ে কন্যাকে ঝুলিয়ে দেন। ঐ অধ্যাপক পুত্রের বেকারত্ব ঘোচেনা এই যা ট্রাজেডি।

কিন্তু ডক্টরেট জোগাড় করা যে এখন জ্ঞানলাভের চেয়ে অন্য ধান্দায় জরি তার একটি সুন্দর উপাখ্যান আমাকে বলেছিলেন সহকর্মী অদ্রিশ রায় বর্মন। বসিক ও বিদ্বন - জ্ঞানপিপাসু। তাঁর কাছে একদিন দুই প্রাক্তন ছাত্র এসে হাজির - সুনীল ও প্রকাশ। দুজনেই কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বি. এ অনার্স ও এম. এ পাশ করে দুটো গঞ্জ এলাকার স্কুলে পড়ায়। তাদের দুজনের হঠাৎ একসঙ্গে জ্ঞানস্পৃহা জেগে উঠেছে তাই ডক্টরেট না করলেই হয়। অতএব শরণ নিতে অদ্রিশ বাবুর কাছে এসে হাজির। 'আপনিই ভরসা স্যার - আপনার তো ব্যাপক যোগাযোগ।' সব শুনে অদ্রিশ বললেন, তোমাদের এই ডক্টরেট লেলে কী সুবিধা হবে?

সুনীল বেশ বলিয়ে কইয়ে ছেলে বরাবর। বলল, আলনি আমাদের স্যার - আপনাকে গোপন করে লাভ নেই- ডাক্তারেরকাছে যেমন রোগ লুকোতে নেই। সরাসরি বলছি, স্যার, আমরা হেডমাস্টার হতে চাই। তাই পি. এইচ. ডি হচ্ছে মাস্ট। এবারে বলুন কী করতে হবে।

মেজ সেজ যে কোনও ঋবিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি হলেই চলবে তো? আচ্ছা আমি একটা চিঠি লিখে চিচ্ছি অমার প্রাক্তন সহকর্মী এখন ... ঋবিদ্যালয়ের প্রফেসর। কিছু একটা করবেন নিশ্চয়ই।

হৃষ্টচত্তে চিঠি নিয়ে তারা নাচতে চলে গেল। তারপরে দেখা করল মাস চারেক পরে। 'রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, আপনার বন্ধু খুব সামায্য করেছেন স্যার।' অদ্রিশ খুব খুশি। সামান্য ছাত্রকৃত্য কার গেল। গবেষণার বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ দুই জেলার ভাষা - ধরা যাক বাঁকুড়া ও বীরভূম। সুনীল আর প্রকাশের সঙ্গে একদিন পথে দেখা। তারা সোৎসাহে জানাল, টেপরেকর্ডার নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে - সজীব ভাস্বর চলতি নমুনা সংগ্রহে খুব রোমাঞ্চকর।

বছর দুয়েক পরে অদ্রিশের কাছে আবার আবির্ভার যুগল মূর্তির। সঙ্গে মিষ্টির বড় প্যাকেট - সাফল্যের প্রতীক। মুখে লক্ষ্যভেদের হাসি। অদ্রিশ কৌতূহলবশত জিগ্যেস করল, তোমরা জেলার সীমানা কী ভাবে ধরলে ? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাউন্ডারি না লিঙ্গিউইস্টিক বাউন্ডারি ?

ওসব তো আমরা কিছু জানি না স্যার। এখনকার বাঁকুড়া বা বীরভূম বলতে যেটা বোঝায় সেটাই সীমানা ভেবেছি আমরা। ভাষাগত সীমানা কখোনো আলাদা বুঝি? জানিনা তো?

তোমরা ঠিক কী করলে ?

চেপরেকর্ডারে নানা রকম আঞ্চলিক শব্দ, তার উচ্চারণ, প্রবাদ প্রবচন, গান, ছড়া এইসব সংগ্রহ করে সাজিয়ে দিয়েছি, স্যার যেমন যেমন বলেছেন।

বাঃ বেশ অদ্রিশ বললেন, তো ভাষাতত্ত্বের প্রধান তিনটে অংশ হল ফনোলজি বা ধবনিতত্ত্ব, মরফোলজি বা রূপতত্ত্ব অর সেমানটিক্স বা শব্দার্থতত্ত্ব - তোমাদের কাজটা ঠিক এর কোন্ দিকে ?

সুনীল আর প্রকাশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ভীতকণ্ঠে বলল, আমরা যাচ্ছি স্যার।

পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিদ্যালয়ে তারা অবশ্য এখন দুজন প্রতিষ্ঠিত প্রধান শিক্ষক। হাইলি কোয়ালিফায়েড হয়ে যাওয়া মন্দ কথা নয় - তবে তাতে কাঠকড় পোড়াতে হয়। অন্যের মুখে শোনা ঘটনার চেয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বলা ভাল। নববইয়ের দশকের গোড়ার কথা। তখন কাজ করছি এক সরকারি কলেজে, তার অফিসার-ইন-চার্জ আমারই প্রাক্তন ছাত্র ব্রজেন দেন। একদেন বিনীতভাবে সে বলল, স্যার তেতলার ঘরে একটা স্পেশাল পরীক্ষা হচ্ছে, আপনাকে অল্পক্ষণের জন্যে একটু ইনভিজিলেশ্যন দিয়ে দিতে হবে। এই ধন এক ঘন্টা। ওল্ড সিলেবাসের পাশ কোর্স বি. এ। এবারেই ক্যান্ডিডেটদের লাস্ট চান্স। গত দুবার ওরা ফেল করেছে। একটু যান স্যার। কাল ইংরিজি হয়েছে, আজ বাংলা।

গেলাম। জনা তিরিশের পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থীণী। বয়স তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশের কোঠায়। ক্লান্ত হতাশ মুখ। সঙ্গে বইখাতা। প্রশ্নপত্র দেবার আগে বললুম, বইখাতা সব টেবিলে রাখুন।

একজন পরীক্ষার্থী বললেন, স্যার এবারেই আমাদের শেষ সুযোগ। আমরা প্রায় সবাই জুনিয়ার হাইস্কুলে টিচারি করি। বি. এ পাশ না করলে আমাদের চাকরি থকবে না। না টুকলে আমরা পাশ করব না - দয়া কন স্যার। গতকাল ইংরিজি পরীক্ষাতেও স্যার যিনি ছিলেন তিনি আমাদের রিকোয়েস্ট বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

আমি দিশেহারা হয়ে বললাম, কী বলছেন আপনারা? আপনারা শিক্ষকতা করেন? চাকরি পেলেন কী করে? এখন এইভাবে কোয়ালিফায়েড হবেন? টুকে? - একটু থেমে পরিহাসের সুরে বললাম, কিন্তু টুকেও তো আপনারা পাশ করতে পারবেন না - কী টুকবেন জানেন? বরং আমি ঘরে থাকলে বলে দিতে পারব কোন্টা টুকবেন, কতটা টুকবেন তাই না?

হ্যাঁ স্যার। তাহলে থাকুন স্যার - সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আমি লজ্জা ঘৃণায় আত্মগ্লানিতে ঘর তেকে বেরিয়ে এলাম।

গত মাসে বোলপুর হয়ে পালিতপুর যাচ্ছিলাম। পথে একজায়গায় বাসের টায়ার ফাটলো। কন্ডাকটার বলল, নেবে যান গো সবাই - এখন অন্তত আধঘন্টা লাগবে টায়ার বদলাতে। চা সিগারেট খান সব। সামনের একটা দোকানে একজন হাঁকছিল, গরম চপ আর গরম চা - আসুন সব।

চপে কামড় মেরে বোকা। গরম খুবই কিন্তু আলুর চপ নয়, লাল কুমড়ো চটকে চপ। জঘন্য। কেউ কেউ ঝাঁঝিয়ে উঠল, এ কি? কুমড়োর চপ কেন? আলু কই ? চতুর দোকানদার বলল, আলুর চপ তো বলিনি - বলেছি গরম চপ। আলু ছটাকা কেজি আর ডুঁই কুমড়ো দেড়টাকা বুঝলেন?

বীরভূমের অনুন্নত গরীব গ্রাম। অবাক আরেকটু বাকি ছিল - দেশজ মস্করার আরো একটু নমুনা চোখে পড়ল। সামনের দোকানে লেখা সর্বমঙ্গলা স্টোর্স। পানের দোকানের গায়ে পোস্টার মারা রয়েছে পান কন শিক্ষক বিড়ি, ছাত্র বিড়ি।

বহুতর বিড়ির বিজ্ঞাপন ও নাম দেখেছি। কিন্তু শিক্ষক বিড়ি ও ছাত্র বিড়ি? এক দোকানেই ? জিগ্যেস করলাম দুটো বিড়ি কি আলাদা? কান এঁটো করা হাসি হেসে গ্রামীণ দোকানী বলল, আজ্ঞ হ্যাঁ, দুটোই আমার নিজের হাতে তৈরি। ছাত্র বিটি একটু তেজি মশলার, শিক্ষক বিড়ির তেজ কম। দেখছেন তো, মাস্টারদের আর

সেই তেজ কই ?
সপাং করে মুখে পড়ল আরেক চাবুক।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com